তখন ও এখন

গীতা দাস

(১৬)

যুদ্ধে নারী। নারীর যুদ্ধ। কোন যুদ্ধ? স্বাধীনতার যুদ্ধ? গৃহ যুদ্ধ? সামাজিক অবক্ষয় রোধে যুদ্ধ? অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হবার জন্য যুদ্ধ? রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য যুদ্ধ? পারিবারিক শান্তি নিশ্চিত করার জন্য যুদ্ধ?

সব --- সব – যুদ্ধেই নারী রয়েছে যোদ্ধার ভূমিকায়। আর তাই নারীর যুদ্ধ শুধু রাজনৈতিকভাবে সার্বভৌম ভূখন্ডের জন্য যুদ্ধ নয়। তাছাড়া রাজনৈতিকভাবে সার্বভৌম ভূখন্ডের জন্য যুদ্ধ এক সময় শেষ হয়। এখানে শত্রু পক্ষও চিহ্নিত। একবার স্বাধীনতা পেলে পরবর্তী প্রজন্মকে আর যুদ্ধ করতে হয় না।

কিন্তু নারীর নিজের জীবনের স্বাধীনতার জন্য যে যুদ্ধ তা ফুরায় না --- ফুরাচ্ছে না সৃষ্টির আদি লগ্ন থেকেই। নারীর যুদ্ধ সংসারে, সন্তানে, সম্পদে, সংসদে সমান অধিকারের জন্য। এ যুদ্ধে নারীর প্রতিপক্ষ নিজের পুরুষতান্ত্রিক সংসার --- সমাজ এবং নাড়ি ছেঁড়া সন্তানও।

বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে সব সময় --- সার্বক্ষনিক নারীকে লড়তে হয় নিজের অস্তিত্বের উপস্থিতিকে প্রকাশ করার জন্য। নিজের সচল ভূমিকার স্বীকৃতি আদায়ের জন্য।

আমার মা কাকীমাদের সময়ও হত, এখনও হয়। তখন মা কাকীমারা সংসারে কে কি করেছেন এর ফিরিস্তি দিতেন। সারাদিন যে একটুও অবসর পান না তা সুযোগ পেলেই শুনিয়ে দিতেন। জানান দিতেন। সংসারে নিজেদের উপস্থিতির গুরুত্ব বুঝাতেই এসব ফিরিস্তির প্রয়াস।

এখন আমরা – আজকের নারীরা শুধু ঘরে নয় --- সমাজে – Gross Domestic Product (GDP) ---- রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে আমাদের

কাজের স্বীকৃতি চাই। আমাদের সরব উপস্থিতিকে প্রতিষ্ঠা করতে চাই। সমানভাবে অংশগ্রহণ করতে চাই। তবে মা কাকীমাদের মত ঘরে বসে নয় --- সদর্পে এবং সগর্বে নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে।

একান্নবর্তী পরিবারে মা কাকীমাদের সন্তানের উপরও পারবারিক অধিকার খাটত না, আইনী অধিকারের প্রয়োজন পড়লে যে পাত্তাই পেত না এখন তা বুঝি, তখন এভাবে ভাবিওনি, বুঝিওনি।
আমাদের নাওয়া, চুলে তেল দেয়া, ফিতা দিয়ে ফুল তুলে চুল বেঁধে দেয়া সবই করতেন ঠাকুমার বোন। আমার মা কাকীমাদের সাথে ঠাকুমাদের মাঝে মাঝে কথা ঠুকাঠুকি লাগত। এ ঠুকাঠুকির বেশির ভাগ সময়ই উত্স হতাম আমরা ----ছোটরা। আমাদের উপর আমার মায়ের চেয়ে ঠাকুমাদের আধিপত্য বেশি খাটত। মা কোন কারণে আমাদেরকে বকা দিলে বা কোন কারণে মারলে ঠাকুমারা তা কিছুতেই সহ্য করতেন না। উনাদের যুক্তি ছিল জন্ম দেয়া ছাড়া মা আমাদের জন্য তেমন কিছু করেন না যে শাসন করাতে পারেন। ঊনাদের নাতনী যা করে করুক। কাকারা তো শাসন করেই, আবার মায়েরও কেন শাসন করতে হবে?
বাবা অবশ্য এ ব্যাপারে কখনও কিছু বলতেন না এবং আমাদের শাসনও করতেন না। অন্য আট দশটা একান্নবর্তী পরিবারের মত কাকারাই শাসন করতেন। মায়ের দেয়া শাস্তি কাকাদের চেয়ে কম হলেও উচ্চস্বরে কাঁদতাম ব্যথা পেয়েছি বলে। আমাদের এ কষ্ট ঠাকুমারা সহ্য করতে পারতেন না। মায়ের চেয়ে ঠাকুমাদেরকে বেশি দরদী মনে হত। আর মা ঠাকুমাদের ঠুকাঠুকিতে আমাদের কান্না থেমে যেত।

আশে পাশের বাড়িতেও প্রায় একই চিত্র। নাতি নাতনী নিয়ে প্রায়ঃশই শাশুড়ি বউএর ঝগড়া চলত।
ছোটবেলা থেকে মেয়েকে শেখানো হয় তাকে আজীবন পরের ঘর করতে হবে। এজন্য ধৈর্যশীল হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রত্যেক মা তাই তার

মেয়েকে ধৈর্যশীল হওয়ার চর্চা করাতে আপ্রাণ চেষ্টা করে। আমার মা ও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না।
আমাদের নিয়ে মায়ের সাথে ঠাকুমাদের কথা কাটাকাটির কোন এক পর্যায়ে মা প্রায়ই বলতেন ......
"মার কথাটি সহ্য হয় না
কেমনে করবে পরের ঘর
কূলের বধূ ভাঙ্গল সোনার ঘর।"

ঠাকুমাদেরও তাত্ক্ষণিক উত্তর ছিল ...
'মায় করে পর পর
মায় করে কার ঘর?'
অর্থাৎ মা নিজেইতো পরের ঘর করে। নিজে পরের ঘর করে মেয়েকে খোটা দেয়ার কি আছে? এক্ষুণি মেয়েটাকে কেন এমন কড়া কড়া কথা বলতে হবে? ঠাকুমাও কী উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে সে ও পরের ঘরেই আছেন!
নারীদের নিজের কোন ঘর নেই – এ চরম সত্যটি এখন যেভাবে বুঝি তখন সে ভাবে বুঝিনি। ভার্জিনিয়া উলফ এর A Room of One's Own উপলব্ধির সাথে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের নারীর উপলব্ধির পরোক্ষভাবে হলেও সামঞ্জস্য রয়েছে বৈকি!

জীবনের সীমাবদ্ধ গন্ডির মধ্যে ঝগড়ার হেতু আপাত ঠুনকো এবং ক্ষণস্থায়ী মনে হলেও কথোপকথন কিন্তু তাত্পর্যপূর্ণ ছিল।
নবম শ্রেণীতে উঠার পর আমি ছিলাম মানবিক শাখায়। যে সব সহপাঠীরা বিজ্ঞান শাখায় পড়ত তারা ছিল সংখ্যায় খুবই কম। তাই তারা পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ণ ও উচ্চতর গণিত বিষয়ক ক্লাস করতে অন্য ছোট কক্ষে যেত। ঐ সব ক্লাসে যাবার সময় ও এসে খুব গর্বের সাথে আমাদের শুনিয়ে শুনিয়ে বলত ---- ফিজিক্স ক্লাসের নিউটনের মাধ্যাকর্ষন তত্বটি কী ইন্টারেস্টিং না? আপেল কেন উপরে না উঠে

মাটিতে পড়ে? কেমিস্ট্রি ক্লাসের অমুকটি যথেষ্ট মজার। কিংবা উষ্চতর গণিত খুব কঠিন।
আমাদের মানবিক শাখার কেউ কেউ পাল্টা শুনাত ---ইকোনোমিক্স ক্লাসের ডিমান্ড ও সাপ্লাই থিওরির কমলালেবুর উদাহরণটি ফাটাফাটি। পৌরনীতি না পড়ে কী সুনাগরিক হবার গুণাবলী অর্জন সম্ভব? আচ্ছা, বলত বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত আমেরিকার পতাকাবাহী কোন জাহাজে কোন শিশু জন্মগ্রহণ করলে সে কোন দেশের নাগরিক হবে?
অর্থাৎ নবম শ্রেণীতে উঠে আমরা সবাই যার যার বিষয় নিয়ে অহংকারী ছিলাম। ভাবতাম কত জ্ঞান আহরণ করছি।
বিজ্ঞান শাখায় যারা পড়ত তাদের প্রায় সবারই স্বপ্ন ছিল চিকিৎসক হবার। মানবিক শাখায় যারা পড়তাম তাদের ইচ্ছে ছিল কেউ কলেজে পড়াব, কী স্কুলে, কেউ বা সরকারি চাকুরিজীবী হব অথবা ব্যাংকার অথবা সাংবাদিকতা করব। পরে দেখা গেছে আমরা মাত্র কয়েকজন অনার্সসহ স্নাতকোত্তর পর্যন্ত যেতে পেরেছি। আমার চেয়ে মেধা ও মননে উষ্চমানের সহপাঠীরাও উষ্চশিক্ষা গ্রহণের আগেই ঝরে পড়েছিল। কেউ আর্থিক কারণে, কেউ সামাজিক টানা পোড়েনে, কেউ বা পরিবারের গতানুগতিক মনোভাবের জন্য।

কেউ কলেজে ভর্তি হয়েই স্বামীর ঘরে, কেউ আই এস সি পাস করে শাখা বদলিয়ে বি এ ভর্তি হয়েছে, কেউ বা চাকরিতে যোগদান করেছিল। কেউ বি এ ভর্তি হয়ে বিয়ের জন্য অপেক্ষা, আর পড়েনি , কী ইন্টারমিডিয়েটেই অকৃতকার্য হয়ে বিয়ের পিঁড়িতে। অথবা বিএ পাস করেও শুধুই গৃহিণী।
তখন উষ্চশিক্ষার শতকরা হার হয়ত ছিল এক বা দুই। আর এখন আশার আলো হচ্ছে আমার মেয়ের সহপাঠীদের শতকরা দু'একজনও উষ্চশিক্ষা থেকে ঝরে পড়েনি।
অবশ্য আমাদের চেয়ে আমাদের মেয়েদের পেছনে বিনিয়োগ বহুগণ বেশি। এ শুধু পরিবারের আর্থিক বিনিয়োগ নয়, সাথে মনোযোগ, শ্রম

ও সময় বিনিয়োগ। অন্যদিকে আন্তর্জাতিকভাবে নীতি নির্ধারণ (যেমনঃ MDG), রাষ্ট্রীয় সুযোগ, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, সরকারী পরিকল্পনা ও প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন তো রয়েছেই।

গীতা দাস
ঢাকা
১১শ্রাবণ,, ১৪১৫/ ২৬জুলাই, ২০০৮
grdas2006@yahoo.com